।। প্রথম অধ্যায় ।।

ভারতের জাতীয় আন্দোলনের একটি পর্যায়

বঙ্গভঙ্গ — স্বদেশী আন্দোলন

* * * * *

প্রথম অধ্যায়

১৮৮৫ – ১৮৯৪ কংগ্রেসের প্রস্তুতি

উনবিংশ শতাব্দীর শেষে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন দানা বেঁধে উঠতে লাগল। জাতীয় কংগ্রেসের যতই সমালোচনা হোক না কেন এই আন্দোলনের পৃষ্ঠভূমি তে ছিল কংগ্রেস। কংগ্রেস তখন ছিল সকল জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের একটি 'জাতীয়স্থান' National Platform। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কংগ্রেসে যোগদান কংগ্রেসের চরিত্রকে পাল্টে দিয়েছিল। ম্যালেসন নামে এক ঐতিহাসিক বলছেন "গোলযোগ প্রবন বাঙালীদের যোগদানের ফলে কংগ্রেসের চরিত্র বদলে যায়।" ১

এই যুগের কংগ্রেস নেতারা বিশ্বাস করতেন যে ইংলন্ড গণতান্ত্রিক দেশ। ইংলন্ডের রাজনৈতিক সচেতন মানুষ নিশ্চয়ই ভারতীয়দের গণতান্ত্রিক অধিকার ও দাবীগুলির প্রতি যথাযোগ্য মানবিক সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করবেন। এই সময় কংগ্রেস ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী প্রচারের সাথে সাথে ইংলন্ডেও জনমত গঠনের চেষ্টা করেন। দাদা ভাই নৌরজী জীবনের অধিকাংশ সময় ইংলন্ডে অতিবাহিত করেন। ইংলন্ডবাসীর দৃষ্টিকোন ভারতীয়দের পক্ষে নিয়ে আসাই ছিল তাঁর প্রধান উদ্যোগ। কংগ্রেসের আদি যুগের নেতারা সুস্পষ্টভাবে ইংরেজ সরকারের সাথে সংঘাত এড়িয়ে চলতেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল আবেদন নিবেদন বা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পথে দাবী আদায় করা। এঁদের মডারেট বা নরম পন্থী বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল। এই নরম পন্থী নেতৃবৃন্দ কখনও দাবীর জন্য সংঘাতের পথে যেতে প্রস্তুত হন নি।

তাঁদের বিশ্বাস ছিল ইংলন্ডে কর্তাব্যক্তিদের কাছে তাঁদের দাবী ঠিকমত তুলে ধরলেই তাঁদের অভিষ্ট সিদ্ধিলাভ করবে ।

ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এ্যসোসিয়েসন এর যুগ হতে কংগ্রেস এগিয়ে এলেও তাদের আবেদনের সুর বা আন্দোলন পদ্ধতিগত দিকের কোন পরিবর্তন হয় নি । চরম পন্থী নেতৃবৃন্দ একে ভিক্ষুকের রাজনীতি বলতেন (Mendicant Policy) । বঙ্কিম চন্দ্র কমলাকান্তের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন " জয় রাধে ভিক্ষা দাও গো ইহাই আমাদের পলিটিক্স । " এই রূপ কুকুর জাতীয় রাজনীতির অবসান ঘটিয়ে তিনি চেয়েছিলেন ' বৃষ ' জাতীয় রাজনীতি ।

এই নরম পন্থী নেতৃবৃন্দরা ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন । ইংরাজী সভ্যতার প্রতি তাদের ব্যক্তিগত মোহ ছিল । তাঁরা অনেকেই মনে করতেন যে ভারতে ব্রিটিশ শাসন ছিল এক ঐশ্বরিক অবদান । তাঁরা স্বীকার করতেন ইংরাজ শাসনে ভারতের অনেক উন্নতি হয়েছে । ইংরেজ ভারত ছেড়ে চলে গেলে ভারতীয়রা ভীষণ বিপদে পড়বে । তাঁরা ভারতীয়রা পূর্ণ স্বায়ত্ব শাসন লাভ করার যোগ্য হয়নি । ইংলন্ডের অধীনে থেকেই ভারত এই যোগ্যতা অর্জন করবে । এ ছাড়া বিভিন্ন শ্রেনীর জন্য বিচ্ছিন্ন ভাবে তারা দাবী জানাতেন । সমগ্র ভারতবর্ষের দাবীর কথা বা দাবীর দিক দিয়ে সর্বভারতীয় ঐক্য গড়ার প্রচেষ্টার অভাব ছিল । ডঃ সুমিত সরকার , এই যুগের কংগ্রেসের নেতাদের ' খন্ডকালীন রাজনীতিক ' বলে বর্ণনা করেছেন । সারা বৎসর ধারা বাহিক ভাবে কংগ্রেসের কোন কর্মসূচী ছিল না । তাই কেউ কেউ একে ' তিন দিনের তামাসা ' বলতেন ।

মডারেট নেতারা ইংরেজ শাসনের কুফল সম্পর্কে সচেতন ছিলেন । এঁরা বিশ্বাস করতেন ভারতবাসীর মধ্যে দেশাত্মবোধের উন্মেষ ঘটলেই ব্রিটিশ শাসন আপনা থেকেই ভেঙে পড়বে । এইজন্য জাতীয়তাবাদ সৃষ্টি করাই ছিল তাঁদের কাজ ।

কংগ্রেস সেই অবধি কোন সক্রিয় আন্দোলনাত্মক ভূমিকা গ্রহণ না করলেও কংগ্রেস নিজেকে জনসাধারণের প্রতিনিধি বলে বিবেচনা করতে শুরু করেছিলেন। গোপাল কৃষ্ণ গোখলে প্রমুখ নরম পন্থী নেতাদের এই জাতীয় ভিক্ষা সুলভ মনাবৃত্তিতে বিরক্ত হয়েই জন্ম নিয়েছিল চরম পন্থী দলের। তবে এই চরম পন্থী দল ১৯০৭ অবধি কংগ্রেসের মধ্য হতেই এই চরম পন্থার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এই দুই গোষ্ঠীর মতভেদের প্রাবল্যের সময় ভারতের ভাইসরয় হয়ে এলেন লর্ড কার্জন। যাঁর উপস্থিতি ভারতের জাতীয় আন্দোলনে এক বিস্ফোরণ ঘটালো।

লর্ড কার্জনের আগমন ও বঙ্গ বিভাগ

লর্ড কার্জন ভারতে এলেন ১৮৯৮ সালে। ভারতবর্ষে তখন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের জোয়ার চলছে। কার্জন ছিলেন স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন শাসক। একচ্ছত্র সাম্রাজ্যবাদী মনোবৃত্তির সাধক ছিলেন তিনি। লর্ড কার্জন ~~লর্ড কার্জন~~ এদেশে প্রথম পদক্ষেপেই ঘোষণা করলেন যে তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য হলো শান্তিপূর্ণ ভাবে কংগ্রেসের মৃত্যু সুনিশ্চিত করা "assisting Congress to a Peaceful demise". ইংরাজী শিক্ষিত ভারতীয় মনীষীদের তিনি ভাল চোখে দেখেন নি। তিনি চেয়েছিলেন এই জাতীয়তাবাদী বাঙালী নেতৃবৃন্দকে তাঁর আয়ত্বাধীনে আনতে। বাংলা সেদিন জাতীয় জাগরণের তীর্থক্ষেত্র। কলকাতা এই জাগরণের হৃদস্পন্দন। তিনি বাঙালীদের প্রথম আঘাত হানলেন ১৮৯৯ সালে কলকাতা কর্পোরেশনের ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে। শিক্ষা ব্যবস্থা ও বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকারী আওতার মধ্যে আনলেন বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯০৪ এর মাধ্যমে ও শেষ আঘাত হলো বঙ্গভঙ্গ।

লর্ড কার্জনের মধ্যেই শুধু নয় এই বাংলার নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদের প্রচারক বাঙালী মনীষীগণের সম্পর্কে বহু ইংরেজের ধারণা ভাল ছিল না। বহু ইংরেজ

অফিসার বাঙালীদের ভাল চোখে দেখতেন না । ১৮৫৭ এর বিদ্রোহের যাঁরা বিরোধিতা করেছিলেন তাঁদের সকলকেই ইংরেজরা পুরস্কৃত করেছিলেন । কিন্তু বাঙলার দাবী ছিল সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা ইংলন্ড ও ভারতবর্ষে দুই স্থানে এক সাথে হোক । সে অনুরোধ পালিত হয়নি । বরং সলসবেরী কর্তৃক সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার বয়স কমিয়ে ২১ থেকে ১৯ এ আনা হয় । জিওঃ ট্রেভিলিয়ান বাঙালীদের মিথ্যুক ভাবতেন । স্ট্রেচি বলতেন ' কোনও গুরুত্বপূর্ণ পদ বা ক্ষমতা , বিশেষ করে জেলা শাসকের পদটি যেন কখনো কোন বাঙালীকে না দেওয়া হয় । এমন কি ডাফরিন মনে করতেন কংগ্রেসের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথের অনুগামীরা অধিকতর ' হিংস্র ও অভদ্রদের উপদল ' । সুরেন্দ্রনাথের দলকে আয়ার্ল্যান্ডের হোমরুল পন্থীদের সাথে তুলনা করেছিলেন এবং ডাফরিন এই দলের মধ্যে পেয়েছিলেন 'bastard disloyality'।

এই সময় ভারত সচিব ব্রডরিক কে লেখা এক চিঠিতে কার্জন লিখছেন – " বাঙালীরা নিজেদের একটা মহাজাতি মনে করে এবং তারা এমন একটা ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে যখন দেশ থেকে ইংরেজরা বিতাড়িত হয়েছে এবং জনৈক ' বাবু ' কলকাতার লাট প্রাসাদে অধিষ্ঠিত । এই সুখ স্বপ্নের প্রতিকূল যে কোনও ব্যবস্থা তারা নিশ্চয়ই ভীষণ ভাবে অপছন্দ করবে । আমরা যদি দুর্বলতা বশত তাদের হট্টগোলের কাছে নতি স্বীকার করি তবে কোন দিনই আর বাঙলার আয়তন হ্রাস বা বাঙলার ব্যবচ্ছেদ সম্ভব হবে না । (এ পরিকল্পনা গ্রহণ না করলে) আপনি ভারতবর্ষের পূর্ব সীমান্তে এমন একটি শক্তিকে সংহত ও সুদৃঢ় করবেন যা এখনই প্রচন্ড এবং অদূর ভবিষ্যতে যা সুনিশ্চিত ভাবে ক্রম বর্দ্ধমান অশান্তির উৎস হয়ে উঠবে ।" ৩

লর্ড কার্জনের পূর্বেই প্রদেশ গুলোর কাঠামো গত পরিবর্তনের চেষ্টা চলছিল । ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত বাঙলা প্রেসিডেন্সী ছিল সর্ব বৃহৎ প্রদেশ । বাঙলা, বিহার , ছোট নাগপুর , উড়িষ্যা ও আসাম ছিল এ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্ভুক্ত । এই

প্রদেশের লোক সংখ্যা ছিল প্রায় ৮ কোটি । ১৮৬৭ সালে বড়লার্ট লর্ড লরেন্স উড়িষ্যা ও আসামকে বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন করার সুপারিশ করেন । ১৮৭৪ সালে বাংলা থেকে আসাম বিচ্ছিন্ন করে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশে গঠন করা হয় । অবশেষে এন্ড্রু ফ্রেজার বাংলার গর্ভনর হয়ে আসেন ১৯০১ সালে । তিনি ১৯০৩ সালে বঙ্গ বিভাগের একটা খসড়া রচনা করেন । ফ্রেজার এ প্রস্তাবে পূর্ব বঙ্গের চট্টগ্রাম বিভাগ এবং ঢাকা ও ময়মন সিংহকে আসামের সাথে যুক্ত করে বাংলা প্রেসিডেন্সীর আয়তন হ্রাস করার প্রস্তাব দেন । কার্জন প্রস্তাবটি সম্পর্কে অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করলে বড়লার্টের কার্য্য নির্বাহক পরিষদ সরকারী ভাবে ১৯০৩ সালে অনুমোদন করেন । পরে লন্ডন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রস্তাবটি অনুমোদনের জন্য পাঠান হয় । বলা হয় শাসনতান্ত্রিক সুবিধার জন্য এই বঙ্গভঙ্গের প্রয়োজন এবং পুনর্গঠিত প্রদেশটি ' পূর্ববঙ্গ ও আসাম ' নামে পরিচিত হবে । সেই সঙ্গে ছোট নাগপুর বিভাগটিকেও বাংলা প্রেসিডেন্সী থেকে বিচ্ছিন্ন করে মধ্যপ্রদেশের সংযুক্ত করা হবে বলে জানান হয় । কেন্দ্রীয় সরকারের সেক্রেটারী হার্বার্ট রিজলী বাংলার সরকারকে সতর্ক করে দিয়ে লিখিলেন,

"It is not unlikely that the proposal which is here put forward may meet with keen criticism & perhaps in parts with strenuous opposition. ৪

সত্যই এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে গর্জে উঠল সারা দেশ । ইন্ডিয়ন মিরর (১৩ ডিসেম্বর) , অমৃত বাজার পত্রিকা (১৪ই ডিসেম্বর) বেঙ্গলী ইন্ডিয়ান এম্পায়ার (১৩ই ডিসেম্বর) , হিন্দু পেট্রিয়ট , চারু মিহির (১৫ই ডি) , জ্যোতি , সঞ্জিবনী , ট্রিবিউন (১৭ই ডি , ইংলিস ম্যান (২৩শে ডিসেম্বর) , প্রতিনিধি (২৬শে ডিসেম্বর) জ্বালাময়ী প্রবন্ধ লিখল ।

১৯০৪ , ১৬ই জানুয়ারীতে ' ট্রিবিউন ' লিখল যে বঙ্গচ্ছেদ কারও উপকারে

আসবে না । উপরন্তু লক্ষ লক্ষ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হবে । মানসিক উত্তেজনার তো কথাই নেই । সুতরাং গভর্মেন্ট এর এই পরিকল্পনা যে কার্য্য ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হবে না , একথা মনে করা যেতে পারে ।

বিদেশী পত্রিকা ' ইংলিস ম্যান ' ১৯০৪ জানুয়ারী ২৩এ সম্পাদকীয় প্রবন্ধে প্রতিবাদ জানালো " বাঙ্গার অধিবাসীর কাছে বঙ্গভঙ্গ ব্যবস্থা যে মহা আপত্তিকর , সে কথা বেশী লিখে কাউকে বোঝাবার প্রয়োজন নেই । অতি উচ্চ , অতি কোমল , সকল পর্দ্দায় , সকল খাদে ধিক্কার ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল । কেবল ভাব জগতে নয় জাগতিক বুদ্ধির বিচারে এ পরিকল্পনা কোনো রকমেই গ্রহণ যোগ্য নয় । কেবল বড় বড় সম্প্রদায় নয় , একই সম্প্রদায়ের বিভিন্ন অংশ থেকে প্রতিরোধের চেষ্টা হচ্ছে । ভাবের জগৎ থেকে যে প্রবল ঘৃনা প্রকাশ , তাতে যারা এ আন্দোলন শুরু করেছেন তাঁরাও এর রূপ দেখে বিস্মিত হয়ে উঠেছেন । গভর্ণমেন্টের সমর্থনে অতি হীন একটা শব্দও শোনা যায় নি । এর যদি সামান্য সম্ভাবনাও থাকতো , সেটা বাঙালী জাতির কর্ণভেদী তীব্র নিনাদের কাছে নীরব বা শব্দ নেয়া হীন হয়ে পড়তো । সামান্য বিচারেই নিঃসঙ্কোচে বলা যায় যে সাধারণ নির্বিরোধ বাঙালীকে বিক্ষুব্ধ করে তোলবার এক প্রকৃষ্ট পন্থা আবিষ্কৃত হয়েছে , একটা সমগ্র প্রদেশকে রুখে দাঁড়াবার জন্য সর্বাপেক্ষা ত্বরিৎ এবং সহজ উপায় আবিষ্কার করা হয়েছে । "

দি ইণ্ডিয়ান ডেইলী নিউজ (The Indian Daily News) পত্রিকা ১৯০৪ জানুয়ারী ২৯ তারিখে বক্রোক্তি করে লিখল " পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলী মনে করতো যে , ভারত সরকার অতি দ্রুত আমূল পরিবর্তনের প্রতীক । ব্যাপার দেখে মনে হয় জনমতের বিপক্ষে অহেতুক এতবড় পরিবর্তন সাধন করতে গেলে যে অশান্তি ও সংঘাত বাধবার সম্ভাবনা বহন করছে , তাতে ভারত সরকারের ' র‍্যাডিক্যাল ' বা দ্রুত আমূল পরিবর্তনের লক্ষণই বর্তমান ।

সেই সময় জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান নেতা ছিলেন হেনরী কটন । তিনি সরকারের কাছে হিন্দীভাষী বিহার ও ওড়িয়াভাষী উড়িষ্যাকে পৃথক করে শাসনতান্ত্রিক সমাধানের একটা যুক্তি সঙ্গত পন্থা নেওয়ার কথা বললেন । বাংলার বিশাল আয়তন, শাসন কার্য্যের অসুবিধা , এটাই ছিল ইংরেজের প্রধান যুক্তি । ১৯০৩ সালে কংগ্রেসের অধিবেশনে রিজেলের পরিকল্পনাকে জঘন্য আখ্যা দেওয়া হলো । বলা হল এই পরিকল্পনা ভারতের ঐক্যে আঘাত হানতে উদ্যত হয়েছে ।

১৯০৪ এ কংগ্রেসের অধিবেশন বসল বোম্বাই- এ ।"সভাপতির আসন হইতে বঙ্গভঙ্গের তীব্র প্রতিবাদ করিলেন কটন সাহেব । লর্ড কার্জনের যুক্তি খন্ডন করিলেন । বাঙালী সন্তুষ্ট হইল । কটন সাহেব বাঙালীর প্রশংসা করিলেন : তিনি বলিলেন বাঙালীরা পেশোয়ার হইতে চট্টগ্রাম লোকমত সৃষ্টি করেন এবং পরিচালিত করেন । বঙ্গভঙ্গের দ্বারা বাঙালী জাতির একতা নষ্ট করিবার যে চেষ্টা , ইহাকে তিনি নিন্দা করিলেন এবং দু হাজার সভায় বাঙালী যে এই বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ করিয়াছে তাহাকে উপেক্ষা করা অত্যন্ত কড়া কথায় নিন্দা করিলেন । " ৫

প্রতিবাদ ক্রমশ বলবান হয়ে উঠছে দেখে কার্জন এদিকে বেড়িয়ে পড়লেন ১৯০৮ এর ফেব্রুয়ারীতে পূর্ববঙ্গ ভ্রমনে । কার্জন সাহেব অতিথি হলেন ময়মন সিংহের জমিদার সূর্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরীর । সূর্যকান্ত বাবু দৃঢ় কণ্ঠে বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করলেন । প্রত্যাখ্যাত হয়ে ঢাকার নবাব ও চট্টগ্রামের সেরাজুল ইসলামের মতো গন্যমান্য রহিসদের সমর্থনে কার্জন রিজলে পরিকল্পনার একটি রূপ দেওয়ার চেষ্টা করলেন । বঙ্গভঙ্গ উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি মুসলিম সংখ্যা পরিপুষ্ট জনসভাকে সম্বোধিত করে বললেন " পূর্ববঙ্গের মুসলিম জনগণ , প্রাচীন সুলতান ও সুবেদারদের আমল থেকেই রাজনৈতিক ঐক্য বঞ্চিত , সে ঐক্য তাদের ফিরিয়ে দিতে হবে । " ৬

অন্নদা শঙ্কর রায় লিখছেন " কার্জনের মাথায় ছিল তিন রকম ভাবনা । বোম্বাই, মাদ্রাজ , বেঙ্গল , উত্তম পশ্চিত প্রদেশ , মধ্যপ্রদেশ ও আসাম সব কটাই হিন্দু প্রধান । মুসলিম প্রধান বলতে একমাত্র পাঞ্জাব । তিনি উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ সৃষ্টি করলেন পাঞ্জাব থেকে কতক অংশ নিয়ে । দ্বিতীয় মুসলিম প্রধান হলো সেটা । তাতে আর একটা উদ্দেশ্য সাধন হলো । সম্ভবত রুশ আক্রমণের হাত থেকে ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত রক্ষার সুব্যবস্থা । এরপর সম্ভব পর চিনা আক্রমণের হাত থেকে ভারতের উত্তর পূর্ব সীমান্ত রক্ষার সুবন্দোবস্তের জন্য আরও একটি প্রদেশ গঠনের প্রয়োজন । সেই সঙ্গে আরও এক মুসলিম প্রধান প্রদেশের আবশ্যকতা । সেই সঙ্গে সমুদ্র তটবর্তী জেলাগুলির উপর প্রশাসনিক প্রয়োজন । (এক কথায় বেঙ্গল থেকে একাংশ কেটে নিয়ে তার সঙ্গে আসাম জোড়া দিয়ে পূর্ববঙ্গ ও আসাম নামে এই অভিনব প্রদেশ সৃষ্টি । পদ্মা নদীই দুই দেশের বিভাজন রেখা ।)

লর্ড কার্জন মনের কথা মনে চেপে রেখে কলকাতায় কাকপক্ষীকে জানতে না দিয়ে ঢাকায় গিয়ে নবাব সলিমুল্লা বাহাদুরের আহসান মঞ্জিলে গৃহ - অতিথি হলেন । দুজনে মিলে শলা - পরামর্শ করে এই স্থির হলো যে পদ্মা পারে একটি মুসলমান প্রধান প্রদেশ গঠন করা হবে । তার রাজধানী হবে ঢাকা । বড়লাট আমাদের ইতিহাস জানতেন না । নবাব বাহাদুরও না । তিনি ছিলেন কাশ্মীরী মুসলমান । উর্দু ভাষী ।" ৭

বাংলাকে ভাগ করার চূড়ান্ত প্রস্তাব রচনা করলেন লর্ড কার্জন । সেই প্রস্তাব ইংলন্ডে পাঠানো হয় ২রা ফেব্রুয়ারী , ১৯০৫ । ভারত সচিব ব্রডরিক নিজেও বঙ্গভঙ্গের অসারতার কথা স্বীকার করেছিলেন । তিনি মন্তব্য করেছিলেন " ৪ কোটি ১৫ লক্ষ মানুষের এক বৃহৎ এবং মোটামুটি সুসংহত এক মানব গোষ্ঠী , কলকাতা যাদের সাংস্কৃতিক , রাজনৈতিক ও বানিজ্যিক জীবনের পীঠস্থান , তারা নিজ গোষ্ঠীর পাঁচ ভাগের তিন ভাগ বহু দূরে অবস্থিত এক রাজধানীতে , নতুন এক

শাসন ব্যবস্থার অধীনে চলে যাচ্ছে দেখে আপত্তি জানাচ্ছে । নিজেদের বহু প্রাচীন ঐতিহাসিক যোগ সূত্র ছিঁড়ে যাওয়ার এবং জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট হওয়ার আশংকায় বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে । এতে আমি বিন্দুমাত্র অবাক হইনি । " ৮ এই মন্তব্য করেও তিনি লর্ড কার্জনের প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন ।

১৬ই অক্টোবর, ১৯০৫ বাংলা দেশ বিভক্ত হলো । বাংলা হতে পনেরটি জেলা চলে গেল । বাংলার জনসংখ্যা হলো ৫ কোটি ৪০ লক্ষ । ৪ কোটি হিন্দু এবং ৯০ লক্ষ মুসলমান । পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের জনসংখ্যা হলো ৩ কোটি ১০ লক্ষ । ১ কোটি ৮০ লক্ষ মুসলমান, ১ কোটি ২০ লক্ষ হিন্দু ।

প্রতিবাদের উত্তাল তরঙ্গ

বঙ্গভঙ্গ জাতির স্বাভিমানের মর্মস্থলে আঘাত করল । কোন অজানা এক যাদু মন্ত্রে জেগে উঠল সারা দেশ । কৃষ্ণ কুমার মিত্র তাঁর ' সঞ্জীবনী ' তে সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখলেন " লর্ড কার্জন বঙ্গ দেশকে দ্বিতীয় আয়ার্লান্ড করিবেন । বঙ্গদেশ চিরদিন রাজ ভক্ত, বাঙালী চিরদিন নিরীহ, শান্তশিষ্ট ও আইন অনুগত কিন্তু লর্ড কার্জন যে বিষম শেল বাঙালীর প্রাণে বিদ্ধ করিয়াছেন, তাহার যাতনায় বাঙালী দিকবিদিক জ্ঞান শূন্য হইয়াছে । বঙ্গদেশে মহা অসন্তোষের সঞ্চার হইয়াছে । লর্ড কার্জন বাঙালীর আন্দোলন উপেক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু এই উপেক্ষার ফল শীঘ্রই দেখিতে পাইবেন ।"

' সন্ধ্যা ' লিখল — সরকারের আসল উদ্দেশ্য হলো বাঙালীকে ধ্বংস করা এবং তাকে ইউরোপীয়ানদের মোসাহেব বানানো । ' চারু মিহির ' লিখেছিল " বাংলা

ভাষা - তাহি একটা সমগ্র জাতির ঐক্যমতকে অগ্রাহ্য করে কার্জন একটা কথাই জানাতে চান যে ইংরেজ শুধু অস্ত্রের জোরেই ভারত শাসন চালিয়ে যাবার অধিকার বজায় রাখবে এখন থেকে।" এমনকি এ্যাংলো ইন্ডিয়ান পত্রিকা ইংলিস ম্যান, স্টেটসম্যান, পায়ওনীয়ার, 'দি ক্যাপিটাল' প্রভৃতি পত্রিকাও প্রতিবাদে মুখরিত হলো। 'টাইমস' পত্রিকার অনুবাদ বের হলো 'সঞ্জীবনী' তে - " প্রথমে মনে হয়েছিল এ বুঝি অভিশাপ, সর্বনাশ। সে ভুল ভাঙতে লাগল। ক্রমশ আর দুর্ভাগ্য বলে মনে হয় না। দেশকে দু - ভাগ করার চক্রান্ত এ যেন শাপে বর। অভিশাপ নিতে চলেছে আশীর্বাদের রূপ। মার খেয়ে জেগে উঠেছে মরা।" রামানন্দের 'প্রবাসী' তে একই অভিব্যক্তি — " লর্ড কার্জনের মত খারাপ শাসন কর্তার আগমন অনেকে ভারতের দুর্ভাগ্য বলিয়া মনে করেন। আমি ঠিক তাহা মনে করিতে পারিতেছি না। অত্যাচারী অনিষ্টকারী রাজা ব্যতিরেকে কোথায় কবে প্রজাদের স্থায়ী মঙ্গল, স্থায়ী স্বাধীনতা লাভ ঘটিয়াছে।

..... অনেকদিনের পুরাতন সম্বন্ধ, সম্ভব এবং তজ্জনিত মনোভাবের ও মায়া মমতার (Old Association) দোহাই দিয়া (অবশ্য সত্য কারণ ইহা নয়) দার্জিলিং কে বঙ্গের ছোটলাটের অধীনে রাখিতেছেন, কিন্তু পূর্ব ও উত্তর বাংলাকে এসকল কারণ সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতেছেন। তর্ক যুক্তিতে গভর্নমেন্টের হার হইয়াছে। তবুও গভর্নমেন্ট নিজের গোঁ ছাড়িবেন না। ... এই রূপ এক গোঁয়োমীর গূঢ় কারণ আছে। সে গূঢ় কারণ প্রকাশ্য সরকারী কাগজে নাই। হয়তো বা গোপনীয় কাগজে। যেমন নানা শুভ ইচ্ছা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের কারণ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল, কিন্তু আসল কারণ উচ্চশিক্ষা যথা সম্ভব বন্ধ করিবার ইচ্ছা। তজ্জনই লর্ড কার্জন একটি গোপনীয় মন্তব্যে লিখিয়াছিলেন " I have always thought that Dr. Gooroodas B Banerjee held a brief for his unwerthy client, the Bengali Student, when it is our desire politely to suppres". ৯

কার্জনের ভাষায় বাঙালী ছাত্রেরা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে অযোগ্য , অপদার্থ । তাই প্রয়োজন তাদের সে সুযোগ কেড়ে নেওয়া । " ৯

বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্তে ইংরেজ অটল , দেশের মানুষ সেই সম্পর্কে অবহিত হয়ে গেছিলেন । তবুও আশা ছিল দুর্বার প্রতিরোধে সেই সিদ্ধান্ত যদি বাতিল হয় । বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাবের পর হতেই দেশে শুরু হয়েছে প্রতিবাদ । গঙ্গা পদ্মা সেই প্রতিবাদে কল্লোলিত হয়েছে । সংগঠিত প্রতিবাদ ধ্বনিত হলো ৭ই আগষ্ট , ১৯০৫ সাল ।

কলকাতার দোকান পাট সব স্তব্ধ,বন্ধ । শোকে যেন সমগ্র রাজধানী স্তব্ধ হয়েছে । মানুষের বুক ঠেলে জেগে উঠছে তীব্র আলোড়ন । বিকেলে কলকাতার টাউন হলে জনসভা । এক ঐতিহাসিক সমাবেশ । সারা দেশের নেতারা উপস্থিত । উপস্থিত সাধারণ গরীব মানুষ হতে ছাত্র সমাজ । শচীন্দ্র বসু তাঁর " স্মৃতি তর্পন " এ লিখছেন " এই আগষ্ট টাউন হলে যে বিরাট সভার অধিবেশন হয় , তাহা দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসে স্মরণীয় ঘটনা । বাঙালী যে এরূপ বিপুল জনতাকে সংযত এবং সংহত করিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে চালাইয়া লইয়া যাইতে পারে এ বিশ্বাস পূর্বে অনেকেরই ছিল না । আমাদিগেরও যে organisation করিবার ক্ষমতা আছে আমরা এই দিনই তাহার প্রথম আভাস পাইলাম । "

সেদিনের সভায় গৃহীত হলো চারটি প্রস্তাব । প্রথম , বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং এই আইন প্রত্যাহারের অনুরোধ । প্রস্তাবক মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী , সমর্থক শ্রী আশুতোষ চৌধুরী ও রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী । দ্বিতীয় , বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে দেশ জুড়ে যে অভাবনীয় স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন শুরু হয়েছে তার প্রতি সমর্থন । তৃতীয় , যতদিন না এই বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব প্রত্যাহার করা

হচ্ছে ব্রিটিশ জাত দ্রব্যাদির ব্যবহার নিষিদ্ধ। অর্থাৎ বয়কট। বিলাতী বর্জন। ভারতবাসীর প্রতি বৃটিশ সরকারের অবজ্ঞার প্রতি চরম আঘাত। প্রস্তাবক নরেন্দ্রনাথ সেন। চতুর্থ প্রস্তাব এই আন্দোলন থামবে না। যতদিন না দাবী মেনে নিচ্ছে ব্রিটিশ সরকার।

মতিলাল রায় 'স্বদেশী যুগের স্মৃতিতে' বর্ণনা করছেন সেই স্বদেশী জীবন ধারার বাণী " একদিন ৭ই আগষ্ট প্রভাতে রাজধানীর পথে পথে বৃহৎ রঙমঞ্চে ঘোষণা পত্র আঁটিয়া দেওয়া হইল, ৭ই আগষ্টের বিরাট জনসভায় ব্রিটিশ জন্য বর্জনের জন্য দলে দলে লোক সমবেত হওয়ার আহ্বান – সেদিন বিধাতার ডাকের মতো, তাহা বাঙালীর অন্তস্থলে নূতন আশার ফুলঝুরি ফুটাইয়া তুলিয়া ছিল। সেই উৎসাহের আগুন স্পর্শ করে নাই, এমন লোক ছিল না। আবাল বৃদ্ধ বনিতার অবচেতনার স্তরে অপমানের কশাঘাত বুঝি বড় নির্মম রূপেই বাজিয়াছিল এবং তাহার প্রতিশোধ কামনায় অন্তরে বৃশ্চিক জ্বালার মতো তীব্র অনুভূতি সেদিন জাতিকে পাগল করিয়া তুলিয়াছিল। সে মহা সমারোহ ব্যাপার! সেদিন জাতির বৈশিষ্ট, স্বাতন্ত্র্য তীব্র বাঙালীর সুপ্ত বীর্য নতুন রূপ লইয়া দেখা দিয়াছিল। কাতারে কাতারে রাজপথের উপর দিয়া হরিদ্রা বর্ণ রঞ্জিত উষ্ণীষ মাথায়, স্কুল কলেজের অসংখ্য ছাত্র সেদিন গভীর নিনাদে 'বন্দেমাতরম' শব্দে জগতের হৃৎকম্প উপস্থিত করিয়া ছিল। তেমন শোভা যাত্রা বোধহয় আর হইবে না। .... কল্পনা কাহিনী নহে, সত্যই রুগ্ন যে সেও লাঠি হাতে পথের ধারে এই অপূর্ব জাগরণ চিত্র দর্শনে উৎসাহে আত্মহারা হইয়াছিল, মুমূর্ষুর নয়নে আশার বিদ্যুৎ খেলিয়াছিল।" ১০

এই সভা জনচিত্ত আলোড়িত করেছিল। বাংলা তথা সাড়া দেশ জাগ্রত চিত্তে বরণ করেছিল এই প্রস্তাব। 'বন্দেমাতরম' তার ভাষায় এই দিনটির কথা প্রকাশ করে লিখছে, "The 7th of August was the birthday of Indian Nationalism, and Indian Nationalism means two things, the self concntration to the gospel of National freedom and practice of Independence. Boycott is the practice of

Independence, when therefore, we declared the boycott on the 7th of August, it was no more economical revolt we were instituting, but the practice of Independence, for the attempt to be separate and self sufficient economically must being with the attempt to be free in every other function of a National life, for these functions are nuturally inter dependent. August 7th therefore, is a day when Indian Nationalism was born when India discovered to her soul her own freedom, when we set out feet irrevocably to the only path to unity, the only path to self realization on that day the foundation stone of Indian Nationality was born". ১১

রবীন্দ্রনাথ এসে দাঁড়ালেন আন্দোলনের পুরোভূমিতে। তাঁর কণ্ঠে যেন বরাভয় মন্ত্র। " বিচ্ছেদের চেষ্টাতেই আমাদের ঐক্যানুভূতি দ্বিগুন করিয়া তুলিবে। পূর্বে জড় ভাবে আমরা একত্র ছিলাম। এখন সচেতন ভাবে আমরা একত্র হইব। বাহিরের শক্তি জাগ্রত হইয়া উঠিয়া প্রতিকার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইবে। " জীবন পন করে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথ বললেন বঙ্গভঙ্গ 'A national disaster' সেই সাথে সতর্ক বানী করলেন " আজ আমরা এমন এক আন্দোলনের মুখে এসে দাঁড়িয়েছি, বেগের তীব্রতায় ও বোধের ব্যাপকতায় যা একদিন এই প্রদেশে সৃষ্টি করবে এক অলঙ্ঘনীয় ইতিহাস , এই সত্য ঘোষণায় এক বিন্দু অতি কথনের স্থান নেই। "

এই দৃঢ়চেতা বাগ্মী সগর্বে ঘোষণা করলেন "I will unsettle the settled fact".

দেশবাসীর স্বপ্ন ব্যর্থ হয়নি। ব্যর্থ হয়নি তাদের প্রতিজ্ঞা। দেশবাসীও বুকের পাঁজরে যেন সাহসের বজ্রানল জ্বালিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল আন্দোলনে। আগুন ছড়িয়ে পড়ল গ্রাম গ্রামান্তরে। প্রাসাদ হতে কুটিরে। স্বদেশীজাগরণের মন্ত্রে সবাই বিভোর হলো। দেশকে আরও জাগাতে হবে। কবিরা লিখলেন গান। প্রাবন্ধিকেরা লিখলেন প্রবন্ধ। ঔপন্যাসিক লিখলেন উপন্যাস। নাট্যকার লিখলেন নাটক। শিল্পীরা আঁকিতে বসলেন ছবি। স্বদেশী সমাজ, শিল্প, সাহিত্যের রচনার ঢেউ বয়ে গেল।

উইল ডুরান্ট বললেন "১৯০৫ সালতেই ভারতবর্ষের বিপ্লবের শুরু।" ১৩ চিন্তাবিদ বিনয় সরকারের ভাষায় "বাঙালীর বাচ্চা আমি, বাঙালীর চোখে দুনিয়া দেখি। আমার কাছে ১৯০৫ হচ্ছে বিংশ শতাব্দীর প্রথম বৎসর। এটা একটা খাঁটি যুগান্তর।" ১৪ দেশবন্ধু এই স্বদেশী আন্দোলনে উপলব্ধি করেছিলেন মর্মে মর্মে। তিনি বললেন "প্রাণের যে বন্যা, সে তো অঙ্ক শাস্ত্র মানে না, সে যে সকল মাপকাঠি ভাসাইয়া লইয়া যায়। স্বদেশী আন্দোলন একটা ঝড়ের মত বহিয়া গিয়াছিল, একটা প্রবল বন্যায় আমাদের ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল, প্রাণ যখন জাগে তখন তো হিসাব করিয়া জাগে না। মানুষ যখন জন্মায় সে তো হিসাব করিয়া জন্মায় না, জন্মাইয়া পারে না বলিয়া জন্মায়। .... এই যে মহাবন্যার কথা বলিলাম, তাহাতে আমরা ভাসিয়া ডুবিয়া বাঁচিয়া আছি। বাঙলার যে জীবন্ত প্রাণ, তাহার সাক্ষাৎ পাইয়াছি। বাংলার প্রাণে প্রাণে আবহমান যে সত্তা ও সাধনার স্রোত, তাহাতে অবগাহন করিয়াছি।" ১৫

ভারতের বিপ্লব সাধনার সাথে যিনি একান্ত ভাবে যুক্ত সেই নিবেদিতা লিখলেন "এই স্বদেশী আন্দোলনের প্রেরণায় সমাজ চিত্ত, ধর্ম, সংস্কৃতি, সাহিত্য,

বিজ্ঞান , দর্শন , শিল্পকলা প্রভৃতি বাঙালীর জীবনের সর্বক্ষেত্রে যে সহস্র দল কমলের মতো ফুটিয়া উঠিয়াছে । ইহা আমাদের জীবনের সর্ব প্রান্তরে নব স্রোতধারা সৃষ্টি করিয়াছে ।"

"এই আন্দোলন ভারতবর্ষকে তাহার আত্মোপলব্ধির আদর্শ দিয়াছে । বাংলা দেশের অগ্নি সাধকেরা ইংরেজের অধীনতা হইতে মুক্ত পূর্ণ স্বাধীনতার যে স্বপ্ন দেখিয়াছেন , যে আদর্শ নিজেদের মধ্যে পাইয়াছেন , যে ভাবে তাঁহারা দুঃসাহসিক অভিযানে অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং আপনাদের বহ্নি পাঞ্জর জ্বালাইয়া অন্ধকারময় পথে অগ্রসর হইবার জন্য যে মশাল রচনা করিয়াছেন , তাহা একটি ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছে । স্বদেশী আন্দোলন ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে বাংলার এক সাধনা ।" ১৬

স্বদেশী আন্দোলন জন্ম দিল নতুন সাধনার । দেশের যা কিছু মহৎ যা সুন্দর তাকে নতুন করে চেনবার তাগিদ দেখা দিল । জীবনের ধর্ম কর্ম হতে ব্যবসা বানিজ্য সব কিছুতেই স্বাদেশিক ভাবনার বহিপ্রকাশ ঘটল । নব জাগ্রত দেশপ্রেম তীব্রভাবে আত্ম প্রকাশ করল এই আন্দোলনের বীজ প্রাণ থেকে । এরই প্রভাব পড়ল সাহিত্যে । সাহিত্যে ধরা দিল সকল ভাবনা । সাহিত্যের উজ্জ্বল পর্নে চিরতরে বাঁধা রইলো এই আন্দোলনের ইতিহাস । আন্দোলনের ক্ষেত্র হতে যে সোনালী ফসল ফলানো হলো তা হলো এ যুগের সাহিত্য ।

রমেশচন্দ্র মজুমদার বলছেন " বিদেশী বর্জন ও স্বদেশী আন্দোলনের দুইটি বিশিষ্ট অবদান জাতীয়তার জাগরণ ও বঙ্গ সাহিত্যে তাহার প্রতিক্রিয়া । এই দুইটিই পরস্পর পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । স্বদেশী আন্দোলনে বাঙালীর চিত্তে যে নতুন জাতীয় জীবনের স্পন্দন জাগাইয়াছিল তাহার অপরূপ প্রকাশ পাইয়াছিল বাংলা কবিতা , সঙ্গীত , নাটক ও যাত্রাগানে — আবার এই গুলি জাতীয় জীবনে

দেশ বোধাত্মক ভাবের প্রবল বন্যাও আনিয়াছিল ।" ১৭

এই আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ সুরেন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন
" The Swadeshi movement gave an impetus do all our activities, literary, political and industrial, Literature felt the full impact of the rising tide of National sentiment which bodied itself foth im prase and verse". ১৮ অনুরূপ মন্তব্য [illegible] সুনীতি প্র.
"The literature of that age, graced as it was by the presence of a veritable galaxy of distinguished Bengali Writers- including the very greater of them all was deeply influenced as is will known by the political upsurge. ১৯

স্বদেশী আন্দোলন হতে জাত বাংলা সাহিত্যের সেই পথ পরিক্রমা পরবর্তী অধ্যায় হতে শুরু হলো ।

****

স্বদেশী আন্দোলন — দর্শন ও ভাবনা

বঙ্গভঙ্গ মানুষের প্রাণে জ্বালিয়ে ছিল এক তীব্র বেদনাবোধের আগুন। প্রস্তাব পেশ করার সময় হতে বাংলায় শুরু হয়েছিল আন্দোলনের ঢেউ। প্রতিবাদ ও মিছিলে সমগ্র বাংলার নগর প্রান্তর কম্পিত হয়েছিল। কিন্তু যতই বেদনাহত প্রাণ হোক না কেন একদিন নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের ঢেউ এর গতি স্বাভাবিক ভাবেই রুদ্ধ হয়ে যায় বা স্তিমিত হয়ে আসে। তাই সভা, সমিতি, মিছিল, প্রতিবাদ করে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন চলাকালীন সময়ে এক নতুন আন্দোলনের রূপ দেখা দিল। তার নাম 'বয়কট', বিদেশী দ্রব্য বর্জন কর। সমগ্র বাঙালী সমাজ এই বয়কটের ভাবনায় ভারতের রাজনীতিকে দুর্বার করে তুলেছিল। বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী যুগের বহু পূর্বে শোনা গিয়েছিল এই বয়কটের ভাবনা। ১৯০৫ সালের ১০ই নভেম্বর ধর্মানন্দ ভারতী অমৃত বাজার পত্রিকায় এক পত্র লেখেন। সেই পত্রে তিনি জানিয়েছিলেন দ্বিতীয় পেশোয়া বাজীরাও এর শাসন কালে সপ্তশৃঙ্গ পর্বতে বসবাস কারী গুরুপদ স্বামী, তিনি বলেছিলেন বিদেশী পণ্যের চাপে দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তার প্রতিকার কল্পে তিনি ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশের পণ্য বর্জনের পরামর্শ দিয়েছিলেন। তিনি হয়তো সেদিন ছিলেন 'সন্ন্যাসী একা যাত্রী'। কিন্তু তাঁর কথার প্রতিধ্বনি শোনা গিয়েছিল কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন কালে বয়কটের প্রস্তাব উত্থাপক ছিলেন কৃষ্ণকুমার মিত্র। 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় ১৯০৫ এর ১৩ই জুলাই-এ সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হলো "বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ হইলে বাঙালীর চিরাশৌচ হইবে। যতদিন ছিন্ন অঙ্গ পুনরায় একত্র না হয় ততদিন বাঙালী শোক চিহ্ন ধারণ করিবে। বাঙালী আমোদ প্রমোদ পায়ে ঠেলিয়া সমস্ত বঙ্গ এক করিবার মহা সাধনায় প্রবৃত্ত হইবে। যতদিন সাধনা সিদ্ধ

না হইবে , তপশ্চর্য্যা করিবে । জাতীয় অশৌচের সময় সমস্ত বাঙালী বিদেশী দ্রব্য স্পর্শ করা মহাপাতক মনে করিবে । আরেক স্থানে লিখিয়াছেন গভর্নমেন্টের মতিগতি যে রূপ গ্রহণ করিয়াছে , তাহাতে বাঙালীর পক্ষে ইংলন্ডের পণ্য সর্বতোভাবে বর্জন করাই যোগ্য প্রত্যুত্তর । তাহাছাড়া সরকারী বড় কর্মচারী ও সকল সরকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতা বর্জন করিতে হইবে । "

বিদেশী পণ্য বর্জনের নির্দেশ এসেছিল প্রথম দিকটায় ১৮৯৪ সালে যখন আমদানী শুল্ক পুনঃসন্নিবিষ্ট হয় এবং ভারতীয় যে শ্রেনীর বস্ত্র ল্যাঙ্কাশায়ারের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিল , তার ওপর 'উৎপাদন শুল্ক' বসানো হয় । ১৮৯৬ তে ভারতে উৎপাদিত তুলাজাত সকল প্রকার দ্রব্যের বস্ত্রই উৎপাদন শুল্কের আওতায় ফেলা হয় । ম্যাঞ্চেষ্টারের সঙ্গে যে মোটা ধুতির কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই , তাকেও রেহাই দেওয়া হয় নি । রমেশ চন্দ্র দত্ত (Economic History of India in the victorian Age, Fifth Edition P 543)) এই ব্যবস্থার উপর কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করেন । বলা বাহুল্য তাঁর কথার মধ্য দিয়ে সকল চিন্তাশীল ভারতবাসীর মনের কথা প্রকাশ পেয়েছিল । ১৮৯১ থেকে বঙ্গবাসী একাদিক্রমে বয়কট প্রচার করে চলেছে । " ২০

অরবিন্দ এই প্রসঙ্গে বলছেন " ভারতবর্ষের সঙ্গে ইংলন্ডের অর্থনৈতিক ও বানিজ্যিক সম্পর্কের যে লজ্জাকর ছবি রমেশ চন্দ্র দত্তের ' ইকনমিক হিস্ট্রী ' তে উদঘাটিত হয়েছে তার সহায়তা ছাড়া বয়কট নামক অস্ত্র প্রয়োগের জন্য জনসাধারণের মানসিক প্রস্তুতি এতো সহজে গড়ে উঠতো না । এই একটি ক্ষেত্রে নির্দ্বিধায় বলা যায় যে রমেশ চন্দ্র শুধু ইতিহাস রচনা করেন নি , তা সৃষ্টিও করেছেন । " ২১

' ডন সোসাইটি ' র সতীশ মুখোপাধ্যায় বয়কট সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করলেন

" সরকার সমগ্র বাঙালী জাতির অভিমতকে সম্পূর্ণ ভাবে উপেক্ষা ও বয়কট করেছে , সরকারী বয়কটের পাল্টা জবাব হিসেবে জাতি গ্রহণ করেছে আর এক ধরণের বয়কট । তত্ত্বের দিক থেকে বয়কট মতবাদ যতই হিংসাত্মক মনে হোক না কেন , আমাদের পক্ষে এই বিশেষ অবস্থায় বয়কট দর্শন হল জাতির আহত আত্ম মর্য্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করার তীব্র আকাঙ্খা ছাড়া আর কিছু না । " ২২

সুরেন্দ্রনাথ বয়কটকে বঙ্গভঙ্গের অবিচারের প্রতি প্রতিক্রিয়া বলে ভেবেছিলেন , " বয়কটই জাতির নব জাগ্রত মুক্তি আন্দোলনের শেষ কথা নয় । বয়কট হলো একটা অস্থায়ী ব্যবস্থা — এটা একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছবার উপায় মাত্র । এর একটাই লক্ষ্য হলো বাংলার অভিযোগের প্রতি ব্রিটিশ জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা । বঙ্গভঙ্গ রদ করে ঐ অভিযোগ দূর করা হলে বয়কটও প্রত্যাহৃত হবে । " বয়কট সম্পর্কে ভিন্ন সুরে কথা বললেন লাজপৎ রায় । তিনি লিখলেন " স্বীকার করি ব্রিটিশের জনমতের ক্ষমতা আছে আমাদের অভিযোগ দূর করার , কিন্তু পকেটে টান না পড়লে ভারতীয়দের প্রতি অবিচারের দিকে তাদের দৃষ্টি কি আকর্ষিত হবে ? আত্মিক ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামানোর অভ্যেস ইংরেজদের কোন দিনই নেই । সুতরাং নৈতিকতা , সুবিচার , ঔচিত্য - অনুচিতের প্রশ্নতুলে তাদের কাছে আবেদন করাঅরণ্যে রোদন করারই সামিল হবে । ইংরেজরা অত্যন্ত আত্ম সচেতন , স্বাবলম্বী , অহঙ্কার তাদের রক্তে , আর সে জন্যই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে আত্মসম্মানবোধ ও আত্ম নির্ভরতার প্রকাশ দেখলে তারা খুশীই হয় ।" ২৩

তিলক , বিপিনচন্দ্র ও অরবিন্দ বয়কটের মধ্য দিয়ে দুটো উদ্দেশ্য সাধিত হওয়ার কথা চিন্তা করতেন । ম্যাঞ্চেস্টারের উপর চাপ দিয়ে ব্রিটিশ শক্তিকে প্রভাবিত করা ও ব্রিটিশ দ্রব্যের প্রতি যে মোহ বা মায়া বোধ তা দূর করা । চরম পন্থীরা আশা করতেন বয়কটই দেশ বাসীকে স্বরাজের জন্য প্রয়োজনীয় ত্যাগ

স্বীকারে উদ্দীপিত করবে । বয়কটই দেশকে দিলো একদিকে স্বাভিমানের আত্ম দর্শন , অন্য দিকে তুলে দিল লড়াই করার অমোঘ অস্ত্র । বাংলায় বিপ্লববাদের পটভূমি তৈরী হওয়ার জন্য বয়কট সিদ্ধান্ত জরুরী ছিল । এই বয়কট আন্দোলনকে উপলক্ষ করে শাসন যন্ত্রের সঙ্গে প্রকাশ্য বিরোধের ক্ষেত্র বিস্তার লাভ করেছে । রাজদ্বারে দন্ড , পরস্পরের প্রতি আক্রমণ ও সংঘর্ষের বিস্তার লাভ করেছে । কালিচরণ ঘোষ বলছেন "বয়কট আমাদের রণভেরী , ধর্মযুদ্ধের শঙ্খনাদ , শত্রুর প্রতি শর নিক্ষেপ নির্দেশের সংকেত । ২৪ সুরেন্দ্র নাথও অনুভব করেছেন 'Our Industrial helplessness was attracting attention is an increasing measure, and it was readily perceived that the boycott would be double edged weapon, industrial and p political in its scope and character".

বয়কট কিন্তু শুধুমাত্র বিলাতী বস্ত্র বর্জনেই সীমাবদ্ধ থাকেনি । জীবনের সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্য বর্জনে এর প্রভাব পড়েছিল । স্বাজাত্য বোধ যখন এক জাতির জীবনে ফল্গুধারার মতো প্রবহমান হয় তখন জীবনের আনুষঙ্গিক দ্রব্য তুচ্ছ বলে মনে হয় । বয়কট সেই ভাবনার জন্মদায়িনী । বিদেশী দ্রব্য বর্জনকে ঘিরে এক স্বাভিমান বোধ সেদিন ঘিরে ধরেছিল সমগ্র জাতিকে । এক নিদারুণ বেদনা অথবা এক উদগ্র রণ সংগ্রামের প্রেরণা জাতির মনে দানা বেঁধে ছিল । এই ভাবনা ঘিরে গড়ে উঠেছিল সাহিত্য চেতনা । প্রকাশ ভঙ্গী ছিল গান বা কবিতা । স্বদেশী পণ্যের লোপ পাওয়ার জন্য বেদনা বোধ , পরবর্তীতে বর্জনের জন্য মনকে গড়ে তোলা এবং শেষ পর্যায়ে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ বা লড়াই করার সংকল্প গ্রহণ করা ছিল এই সাহিত্য ভাবনার ফসল ।

বয়কট আন্দোলন তখন শুরু হয় নি । তবে ক্ষেত্র প্রস্তুত করলেন কালি প্রসন্ন কাব্যবিশারদ ——

(ভাইসব) দেখ চেয়ে বাজার ছেয়ে
আসতেছে মাল বিদেশ হতে
আমাদের বেচা কেনা পাওনা দেনা ,
অভাব মোচন পরের হাতে
আমাদের পিতল কাঁসা ছিল খাসা
কাজ চালাতাম কলার পাতে
এখন এনামেলে মাথা খেলে
কলাই করার ব্যবসাতে ।

দেশীয় শিল্পে চলছিল তখন অভাব বোধ । দেশের শিল্প পণ্যের বাজার তখন ধুঁকছে । সেই বেদনাশ্রিত তীব্র কথন প্রকাশিত হয়েছে মনো মোহন বসুর প্রাঞ্জল ভাষায় —

অতুল , ধন রত্ন দেশে ছিল ,
যাদুকর জাতি মন্ত্রে উড়াইল ।
কেমনে হরিল কেহ নাহি জানিল ,
এমনি কৈল দৃষ্টিহীন ।

তাঁতি কর্মকার করে হাহাকার ,
সূতা যাঁতা ঠেলে অন্ন মেলা ভার
দেশী বস্ত্র বিকায় নাক আর
হল দেশের কি দুর্দিন ।

* * * * *

ছুঁচ সূতা পর্যন্ত আসে তুঙ্গহতে
দিয়াশালাই কাঠি তাও আসে পোতে
প্রদীপটি জ্বালিতে খেতে শুতে যেতে
কিছুতে লোক নয় স্বাধীন ।

বিদেশী দ্রব্যের প্রতি সহজাত আকর্ষন কমতে শুরু করেছে । এখন চায় দেশীয় পণ্য , স্বদেশী দ্রব্য গ্রহনের জন্য আবেদন । এই স্বদেশী দ্রব্যের প্রতি আকর্ষন বাড়াবার জন্য সার্বিক প্রচেষ্টা । কাব্য বিশারদ ভিক্ষে চাইছেন —

" এই ভিক্ষা চাই সদনে তোমার ,
স্বদেশের বস্ত্র কর ব্যবহার ,
বিদেশীর কিছু করো না গ্রহণ ,
যদি তুল্য তার দেশে পাওয়া যায় ।"

দেশ যখন বিদেশী শিকল তারে পিষ্ট , জাতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের যখন বাঁচার তাগিদে জীবিত থাকার প্রয়োজন আছে, তখন শুধু মাত্র দুঃখ প্রকাশে সমস্যা দূরীভূত হবে না । গ্রহণ করতে হবে প্রতিজ্ঞা । শপথ বাক্য নিয়ে জাগাতে হবে দেশকে সর্ব প্রকার জড়তা ও ক্লীবতা থেকে । রবীন্দ্রনাথ বলছেন " পরের ভূষণ পরের বসন , পরের অশন " ত্যাগ করার জন্য । এবং প্রতিজ্ঞা পালা হলো এবার শুরু —

" নব বৎসরে করিলাম পণ
লব স্বদেশের দীক্ষা । "

স্বর্ণ কুমারী দেবী স্বনির্ভরতার উপর জোর দিলেন । এই স্ব-নির্ভরতার শিক্ষা গ্রহণ করতেই হবে । " না লব বিদেশী পণ্য " তার চাইতে " পরিচ্ছন্ন দেশী সাজ " । এতেই নিজেকে ভাগ্যবান মনে করব ।

" এই আমাদের ধর্ম্ম , এই জীবনের কর্ম্ম ,
এই অস্ত্র এই বর্ম্ম আমাদের মুক্তির পথ । "

কবি জ্ঞানেন্দ্র মোহন সেনগুপ্তের প্রতিজ্ঞা —

" আজি ভারতের প্রতি জনে জনে বিদেশের কিছু কিনিব না কেহ
এ দেশের জিনিস যদি পাই "

বিজয় চন্দ্র মজুমদার ভিক্ষে করা থেকে দূরে থাকতে আহ্বান জানালেন —

" যাব না , আর যাব না ভিক্ষে নিতে
পরের দোরে
যা আছে অশন বসন তাই খাব
তাই থাকব পরে । "

সাহিত্যের গান সেদিন জীবনের সর্বস্তরে পৌঁছে ছিল । যেন প্রত্যেকেই নিজ দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এই মহতীকার্য্যে কিছু করার ব্রত নিয়ে । কোন একজন অপরিজ্ঞাত কবি অবধি গান গাইলেন —

" মোটা দেশী বস্ত্রে অঙ্গ আচ্ছাদিয়া ,
বাঙালিনী বেশে করিব পণ ,
লুপ্ত কীর্তি যার করিতে উদ্ধার
সঁপিব সকলে পরাণ মন । "
নব অনুরাগে এস তবে বোন
প্রতিজ্ঞা করিব সকলে আজ
ছুঁইব না আর বিলাতী বিলাস
পরিব না আর বিদেশী সাজ ।। "

সতীশ মুখোপাধ্যায় গর্জে উঠলেন —

" নগরে নগরে জ্বালারে আগুন ,
হৃদয়ে হৃদয়ে প্রতিজ্ঞা দারুণ ,
বিদেশী বানিজ্যে কর পদাঘাত ,
মায়ের দুর্দ্দশা ঘুচারে ভাই । "

শত বৎসরের সাধনা যেন পূর্ণ হয় । দুর্বলতা কাপুরুষতাকে বিসর্জন দিতে হবে । মায়ের সাধনায় মুক্তির পথ । সেই মায়ের কাছে বিজয় চন্দ্র মজুমদারের প্রার্থনা —

" প্রেম ডোরে তব দৃঢ় করি আজি
রাখ বাঙালীরে বাঁধি মা ।
পদতলে দলি বিলাতী বিলাস
তব ব্রত যেন সাধি মা । "

কালিচরণ ঘোষ এই আন্দোলনের উপর মন্তব্য করেছেন " নিতান্ত ভোগ - বিলাসী , দেশের স্বার্থ রক্ষায় পরাঙ্মুখ , সরকারী কৃপাপুষ্ট স্বার্থান্বেষী বাঙালী ছাড়া আর সকলে এই বয়কট আন্দোলনে সাড়া দিয়েছিল । মারামারি নয় , খুন - খারাপি নয় , বিদেশী পণ্য পরিহার করার প্রতিজ্ঞা ও প্রচেষ্টা ইংরেজ বনিক তথা ব্রিটিশ পার্লামেন্টের মাথা ঘুরিয়ে ছেড়েছিল । ... 'বজ্র সমুৎকীর্ণ' ছিদ্র পথে যেমন মনির মধ্যে সূত্রের প্রবেশ সম্ভব হয় , সেই ভাবে বয়কট - সাহায্যে বাঙালী বিদেশী চক্রব্যূহের রন্ধ্র আবিষ্কার করে অভিমন্যুর মত সংগ্রাম করেছে , আর বিদেশী কৌরবকুল ভিতর থেকে শক্তিহীন হয়ে যুদ্ধান্তে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে । .... বয়কট যে সংগ্রাম ঘোষণা করে , তারই উপর কেবল বিপ্লব আন্দোলন নয় , সমস্ত মুক্তি যুদ্ধ সেইভিতের উপরেই গড়ে উঠেছে । " ২৬

বয়কট আন্দোলনের দিকটি ছিল নেতিবাচক (Nagative approach) । বিদেশী দ্রব্য বর্জন করার ভাবনাই পরিব্যাপ্ত ছিল এই আন্দোলনে । তবে কোন দ্রব্য

ব্যবহার করা হবে জীবন যাপনের প্রয়োজনে ? উত্তর ছিল সহজ — স্বদেশী দ্রব্য । তাই বয়কট আন্দোলনের পাশাপাশি চলল স্বদেশী আন্দোলন । তাই স্বদেশী আন্দোলন হলো জাতীয় সৃজনতার আন্দোলন । বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন যেন একই করাতের দুটো ধার । একটিতে কাটছে বৈদেশিক শোষণের ভার আর একটায় কাটছে জাতীয় স্থবিরতার ঘোর ।

"The ideal of, and the agitation for, Swadeshi are in reality nearly as old as the rising national consciousness itself. Arising spontaneously and mostly is an un organised and isolated matter, the swadeshi movement had gathered widespread support in its early years not from the recognised public associations of the period but from the vernacular & from the local efforts of innumerable 'faceless'men".

স্বদেশী আন্দোলনের উপর সমীক্ষা করতে গিয়ে বিপিন চন্দ্র বলছেন —

The Swadeshi movement stood for the encouragement of the use of Indian made manufactures and the non-purchase, rejection, or even boycott of foreign goods". ২৭

এই স্বদেশীর কথা শোনা গিয়েছিল ১৮৪৯ সালে গোপাল রাও দেশমুখের লিখিত 'প্রভাকর' পত্রিকার পৃষ্ঠায় । ভারতের জাতীয়তা বাদের প্রাণ পুরুষ রাজনারায়ণ বসুর দ্বারা উৎসাহিত হয়ে নবগোপাল মিত্র ১৮৬৭ সাল হতেই স্বদেশীর গানে মুখর ছিলেন । এই স্বদেশীর প্রচারে নিয়োজিত ছিলেন মহারাষ্ট্রের মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে ও জি. ভি. যোশী (সার্বজনিক কাকা) এবং বাসুদেব ফাডকে ।

১৮৭৩ থেকে ১৮৭৬ এর মধ্যে বাংলার ভোলানাথ চন্দ্র ' মুখার্জীস ম্যাগাজিনে' এক প্রবন্ধ লেখেন "A voice for the commerce and Manufacture of India". এই প্রবন্ধে তিনি দেশের মানুষকে স্বদেশী প্রেমিক হতে আবেদন জানালেন বিদেশী দ্রব্য বর্জন করে । তিনি লিখলেন, 'What the folly of yesterday has undone, may be replaced by the wisdom of today. Without using any physical force without incurring any disloyality and without praying for any legislature succour, it lies quite in our power to regain our lost position. Nought but our active sympathy has helped the cause of Manchester. The contrary of that sympathy is sure to produce a contrary effect. It would be no crime for us to take the only but most effectual 'weapon of moral hostility, left us in the last extremity. Let us make use of this potent weapon by resolving to non - consume the goods of England and the countervailing tendency of such a resolution will put its right all matters that have gone wrong". ২৮

ভোলানাথ চন্দ ' বয়কট ' শব্দের বদলে তিনি ব্যবহার করেছেন Moral hostality বা নৈতিক শত্রুতা ।

ব্যক্তি বিশেষের চিন্তাধারা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নেয় ১৮৯০ সাল থেকে বিভিন্ন সভা সমিতির অধিবেশনে । ১৮৯৪ এ বিষয় উত্থাপন করেন লালা মুরলীধর জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে । ১৮৯৭ এ রবীন্দ্রনাথ পত্তন করেন ' স্বদেশী ভান্ডার ' । ১৯০৩ এ সরলা দেবী গড়ে তোলেন ' লক্ষীর ভান্ডার ' । ' ডন সোসাইটি ' ও ১৯০৩ এ স্বদেশী বিপনির ভার গ্রহণ করেছিল ।

রবীন্দ্রনাথ বয়কটের প্রতি সমর্থন না দিলেও স্বদেশীকে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলছেন ' বয়কট দুর্বলের প্রয়াস নহে, ইহা দুর্বলের কলহ।' অথচ স্বদেশীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ আত্মশক্তি উদ্বোধনের বিপুল এক সম্ভাবনা দেখেছিলেন। এই আত্ম - শক্তি তাঁর কাছে শুধু আত্ম নির্ভরতার নামান্তরই ছিল না, এর মধ্যে আধ্যাত্মিকতার কিছু স্পর্শ তিনি অনুভব করেছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল " স্বদেশী আহ্বান জাতির সুপ্ত চেতনার দ্বারে আঘাত করবে, আর এই চেতনা জাগ্রত হলে তাঁতি শুধু কাজ পাবে না, অনাথ শুধুই ত্রাণ এবং নিরক্ষর শিক্ষার আলো, তা ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের, জমিদার ও কৃষকের, হিন্দু মুসলমানের, ভোক্তা ও উৎপাদকের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটাবে। পরিণামে হিতৈষণা যুক্ত হবে ঐক্যের সঙ্গে আর বিদেশী শাসনকে আক্রমণ না করেও দেশবাসীর পক্ষে সম্ভব হবে জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা, এক সমান্তরাল গণ শাসন প্রতিষ্ঠা।" ২৯ রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা করছেন " গড়িয়া তুলিবার, বাঁধিয়া তুলিবার একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি যাহাদের মধ্যে সজীব ভাবে বিদ্যমান, ভাঙনের আঘাত তাহাদের সেই জীবন ধর্ম তাহাদের সৃজনী শক্তিকেই যথেষ্ট সচেতন করিয়া তোলে। এইরূপ সৃষ্টিকে নতুনবলে উত্তেজিত করে বলিয়াই প্রলয়ের গৌরব। নতুবা ভাঙন, নির্বিচার বিপ্লব কোনমতেই কল্যাণকর হইতে পারে না।" ৩০

রবীন্দ্রনাথ ১৯০৪ এর জুলাইয়ে ' স্বদেশী - সমাজ ' প্রবন্ধ পাঠ করেন। সেই জনসভার সভাপতি ছিলেন রমেশ চন্দ্র দত্ত। পরে এই স্বদেশী ভাবনা লক্ষ লক্ষ হৃদয়ের মধ্যে চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছিল। আচার্য্য বিনয় কুমার সরকার বলছেন " যুবক বাংলা রবির মুখে স্বদেশী সমাজ শুনে নয়া দুনিয়ার সন্ধান পেয়েছিল। গৌরবময় বঙ্গ বিপ্লবের অন্যতম সূত্রপাত এই বক্তৃতায়। ৩১

অরবিন্দ ও বিপিন চন্দ্রের ভাবনা ছিল বয়কটের পরিধিকে ব্যাপকতর গন্ডীতে

নিয়ে যাওয়া । এঁরা বিশ্বাস করতেন যে দেশবাসীর কর্তব্য সংঘবদ্ধ হয়ে এমন কিছু করা থেকে বিরত থাকা যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইংরেজদের ব্যবসা বানিজ্যর প্রসার ঘটাতে পারে অথবা যার সুযোগ নিয়ে ইংরেজ আমলাশাহী ভারতবর্ষে শোষণের কাজ চালিয়ে যেতে পারে । প্রধানত চারটি ক্ষেত্রেই তারা এই নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের কথা ভেবেছিলেন — অর্থনীতি , শিক্ষা , বিচার ব্যবস্থা ও প্রশাসন । বিপিন চন্দ্রের ভাবনা ছিল যে একটা জাতি যখন অপরের উপর আধিপত্য স্থাপন করে তখন সর্বক্ষেত্রেই বিজয়ী পক্ষ পদানতের অর্থনৈতিক , রাজনৈতিক এবং আধ্যাত্মিক জীবন অবিচার অনাচারে ভরে তোলে আর তখন বয়কটই হয়ে উঠে শৃঙ্খলিতের সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধের মূর্ত প্রকাশ । ৩২ " ব্রিটিশ শাসনের অস্তিত্বের মূলে আঘাত হানলে তার 'মায়া' ছিন্ন হয়ে যাবে — আর এই মায়াই ইংরেজদের সামরিক শক্তির চেয়ে অনেক বেশী পরাক্রান্ত । বয়কট এবং স্বদেশীর ফলে জাতীয় শিল্পের সংরক্ষণই শুধু হবে না , এই দৃষ্টিভঙ্গীই রক্ষা করবে জাতীয় পৌরুষ , জাগিয়ে তুলবে স্বদেশের মুক্তি সংগ্রামের জন্য আত্মত্যাগের বাসনা । বয়কট তাই চরম পন্থীদের কাছে শুধু পরিহারের কেবল মাত্র বর্জনের , একটা নঙর্থক মাধ্যম হয়ে থাকেনি । প্রয়োজন ভিত্তিক অর্থনীতির বাস্তব প্রয়োগের সংকীর্ণ সীমানা ছেড়ে তা বের হয়ে এসেছিল , ন্যায় ধর্মের বর্মাচ্ছাদিত হয়ে জাতীয় শক্তির সেনাপতিত্ব করতে । " ৩৩

স্বদেশী আন্দোলনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ । এই আন্দোলনের ভাবনা ও অভিজ্ঞতা দুটোই তিনি বিশ্লেষণ করেছেন বড় সুন্দর ভাবে । " স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ আমাদের গৃহাঙ্গণেও গিয়ে পৌছল । মহিলাদের হৃদয়ও তা জয় করে ফেলল । মহিলাদের মধ্যে উৎসাহের মাত্রা পুরুষদের চেয়েও বেশী দেখা দিল । স্বদেশী ! স্বদেশী ! স্বদেশী ভাব আকাশ বাতাস ছেয়ে ফেলল ।

" আমার জীবনে আমি বিপ্লব দেখিনি । কল্পনা করেও ধারণা করতে পারছি না , এর স্বরূপ কি রকম । কিন্তু 'স্বদেশী'আন্দোলনের প্রবল বন্যার মধ্যে আমার মনে

হয় যেন আমি বিপ্লবী আন্দোলন দেখা দেওয়ার পূর্বে গণ - চেতনার মধ্যে যে বিরাট পরিবর্তন ও প্রবল উত্তেজনা দেখা দেয় তার কিছুটা ধারণা করতে পেরেছি । সেও এক অদ্ভুত বিস্ময়কর পরিস্থিতি । বৃদ্ধ - যুবা , ধনী - দরিদ্র , শিক্ষিত - অশিক্ষিত সকলেই সেই উত্তেজনায় হেলতে দুলতে লাগল , ছটফট করতে লাগল । এমন কি , যেন কি এক অদৃশ্য শক্তির প্রভাব আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ল । কোন যুক্তি নেই, বিচার বিবেচনার বালাই নেই , কেবল একটি মাত্র প্রবল শক্তিশালী আবেগ গোটা সমাজের হৃদয়কে আন্দোলিত করে তুলল । জীবনের সব কিছুকেই যে সেই আবেগের দিকে টেনে নিয়ে গেল । ....

"স্বদেশী আন্দোলনটি বঙ্গভঙ্গ রদের আলোড়ণের সঙ্গে সৃষ্ট হয় নি । বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলন যে জাতীয় জাগরণের সৃষ্টি করেছে , স্বদেশী আন্দোলন তারই সমকালীন । মানুষের মন এমন কোন নিঃছিদ্র বিচ্ছিন্ন সংকীর্ণ কুঠরী নয় যার মধ্যে জলও প্রবেশ করতে পারে না । এটা একটা সজীব যান্ত্রিক গঠন । তাই যখনই এর কোন দিকে কোন নতুন অনুভূতি দেখা দেয় , তখনই তা সমস্ত যন্ত্রটাকেই স্পর্শ করে এবং সেই অনুভূতি মানুষের সমস্ত কাজের ভিতর দিয়েই প্রকাশ পায় । .... সমাজ সংস্কার , শিল্পের পুনরুজ্জীবন , নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সবকিছুই আমাদের জাতীয় জাগরণের পিছনে পিছনে চলে এসেছে । আর তার মূলে আছে আমাদের নেতাদের রাজনৈতিক কার্যকলাপ । এই ভাবে আরেক বার এই সত্য প্রমাণিত হলো যে সমস্ত সংস্কার মূলক কাজ একটি আর একটির সঙ্গে যুক্ত , একে অন্যের উপর নির্ভরশীল এবং তা পরস্পরের উপর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ঘটায় এবং পারস্পরিক কার্য্য সম্পর্কের মধ্য দিয়ে একে অন্যকে শক্তিশালী করে তোলে । " ৩৪

"In view of such potentialities Swadeshism was regarded by Surtendra nath as of Divine ~~organic~~ origin and he claimed that the Swadeshi leaders are humble instruments in the hands of Divine Providence walking under the illumination of his Holy spirit. He believed that men working under such a

a conviction and fortified by such a belief with we will dare all & do all". ১৩৫

এই স্বদেশী আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল বাংলার প্রান্তর অতিক্রম করে অন্য সকল প্রদেশেও। জাতির জীবনে এই আন্দোলন এনে ছিল সৃজনী প্রতিভা। স্বদেশী আন্দোলনের স্বরূপ ধরা পড়ল সর্বত্র। স্বদেশী সেদিন শুধু ভাবাবেগ নয়, শুধু উচ্ছ্বাস নয়, স্বদেশী শুধু অশ্রুপাত নয়। স্বদেশী বিশাল সৃষ্টির উদ্যম। সমাজ জাগরণের মন্ত্র। শিল্পে আত্মনির্ভরতার দৃঢ় সুনিশ্চয়। সাহিত্যে সোনার ফসল ফলানোর শুভক্ষণ।

* * * * *

প্রথম অধ্যায়

ভারতের জাতীয় আন্দোলনের একটি পর্যায়

১। ভারতে মুক্তি সংগ্রামে চরম পন্থী পর্ব — পৃ ১৭

২। Curzon's speech quoted in 'Revolt of 1905 in Bengal' P-71

৩। Curzon Papers সূত্র-ভারতে মুক্তি সংগ্রামে — পৃ : ১০৩

৪। Risley's letter

৫। বঙ্গভঙ্গ — সমুদ্র গুপ্ত , পৃ : ৩১ - ৩২

৬। Parliamentary Papers, 18 Feb, 1904 সূত্র-ভারতে মুক্তি সংগ্রামে..— পৃ : ১০৩

৭। দেশ , সংখ্যা ২৯শে জানুয়ারী , ১৯৯৪ , প্রবন্ধ — স্বাধীন বাংলার রাজধানী

৮। ডেসপ্যাচ , নং - ৭৫ পাবলিক , সূত্র — ভারতে মুক্তি সংগ্রামে — পৃ : ১০৭

৯ । বঙ্গভঙ্গ – পৃ : ৪১

১০ । জাগরণ ও বিস্ফোরণ – কালিচরণ ঘোষ – পৃ : ১২৩

১১ । পূর্বোক্ত

১২ । A Nation in Making P –

১৩ । The case of India P – 123

১৪ । বঙ্গভঙ্গ – সমুদ্র গুপ্ত – পৃ : ৪৩

১৫ । পূর্বোক্ত – পৃ : ৪৩

১৬ । পূর্বোক্ত – পৃ : ৪৩ – ৪৪

১৭ । বাংলা দেশের ইতিহাস , চতুর্থ খন্ড পৃ : – ৭৮

১৮ । A Nation in Making P – 207

১৯ । The Swadeshi Movement in Bengal 1903-1908 P-7

২০ । জাগরণ ও বিস্ফোরণ – পৃ : ১২১

২১ । অরবিন্দ – বঙ্কিম তিলক দয়ানন্দ – পৃ : ২৬৭

২২ । বঙ্গভঙ্গ – পৃ : ৪৭

২৩ । ভারতে মুক্তি সংগ্রামে – পৃ : ১১৪

২৪ । জাগরণ ও বিস্ফারণ – পৃ : ১২৩

২৫ । A Nation in Making P – 190

২৬ । জাগরণ ও বিস্ফারণ – পৃ : ১০৮

২৭ । The Rise and growth of Economic Nationalism in India P – 122

২৮ । পূর্বোক্ত – পৃ : ১২৬

২৯ । স্বদেশী সমাজ

৩০ । পূর্বোক্ত

৩১ । বঙ্গভঙ্গ – পৃ : ৯৫

৩২ । বিপিন পাল – বয়কট, স্বদেশী, এ্যান্ড স্বরাজ পৃ : ২১৯

৩৩ । ভারতের মুক্তি সংগ্রামে চরম পন্থী পর্ব – পৃ : ১১৭

০৪। A Nation is Making অনুবাদ, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের আত্মকথা — পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা ২৯৮৯, পৃ: ২৫৫ - ৭

০৫। History of Freedom Movement II P-118